বৈশ্বিক জিহাদী জাগরণের মাইলফলক

৯/১১ এর অবিস্মরণীয় অবদানসমূহ

ঐতিহাসিক গাজওয়াতুল বদরের সঙ্গে সমকালের যুগান্তকারী
৯/১১ ঘটনার (তাৎপর্যের বিবেচনায়) সম্পর্ক ও সাদৃশ্য মূল্যায়ন

﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾

[পার্থক্যকারী ঐ দিন, যেদিন উভয় দল মুখোমুখি হয় (সুরা আনফাল ৮:৪১)]

النصر
AN-NASR

সেপ্টেম্বর ২০২২ সফর ১৪৪৪ হিজরী

আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে সত্য মিথ্যার পার্থক্য রচনাকারী ও যুগান্তকারী দু'টি বড় যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করবো। দ্বিতীয় হিজরি সনের ১৭ই রমজান বদরে কুবরা গাজওয়ার সকালটি ছিল ঐতিহাসিক সেই সমস্ত মুহূর্তগুলোর একটি, যখন সারা বিশ্বের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে পূর্বাপর গোটা বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে সে সময় তৎকালীন কাফের শিবির ঐতিহাসিক, যুগান্তকারী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী সেই মুহূর্তকে বুঝে উঠতে পারেনি। কাফের শিবির সে মুহূর্ত থেকে চালু হওয়া ঘটনাপ্রবাহ, সেগুলোর প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল ও তাৎপর্য তখনই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল, যখন আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফত আমলে মোহাম্মদী আরব সেনার পদতলে পারস্য ও রোমের রাজধানীর পতন হয়েছিল।

যেদিন এই পার্থক্য সূচিত হয়েছে এবং দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে সেদিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য এই দিনটি খুবই অর্থবহ ও সুস্পষ্ট এক বিরাট নিদর্শন। প্রত্যেকের জন্যই সেদিনটি ছিল প্রকাশ্য ঐতিহাসিক পার্থক্য সূচক একটি দিবস। এই ঘটনাটি সে সময়ের এবং সেই দিবসের আগের অংশের সঙ্গে পরের অংশের পার্থক্যের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হবার মতো ছিল।

মুসলিমরা কাফেরদের বিরাট দলবলের তুলনায় খুবই স্বল্পসংখ্যক ছিল। প্রথমত মুসলিমদের লক্ষ্য ছিল কাফেরদের একটা ব্যবসায়িক কাফেলার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ। এই কাফেলার সাথে কোনও যুদ্ধোপকরণ এবং রক্তক্ষয়ী লড়াই পরিচালনার মত সামরিক সরঞ্জামাদি ছিল না। অপরদিকে এই খবর শোনার পর কাফের শিবির ব্যবসায়িক কাফেলা রক্ষায় অশ্বারোহীসহ সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণ ও সরঞ্জামাদি নিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছা ছিল, মুসলিমরা সংখ্যায় স্বল্প হয়েও যেন সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ও যুদ্ধের উপকরণ সমৃদ্ধ দুর্ধর্ষ এক বাহিনীর মুখোমুখি হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চেয়েছিলেন মুমিনরা যেন দুর্বল ও সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের প্রথম দিনের (বদরের যুদ্ধে) ঘটনায় বিজয়ী হয়। মুমিনরা তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হবার পর, তা পুনরুদ্ধারের শক্তি-সামর্থ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও যেন এই যুদ্ধে জয় লাভ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছা ছিল - এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সকলেই যেন বুঝতে পারে যে, এই ছোট কাফেলা উল্লেখযোগ্য শক্তি-সামর্থ্য, প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদি ছাড়াই, ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন, বিপুল শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী ও সামরিক উপকরণে সমৃদ্ধ এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেছে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে।

এঘটনার দ্বারা সর্বযুগে কুফরের সঙ্গে ঈমানের চূড়ান্ত পার্থক্য প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। এমন ঘটনার দ্বারাই রহমানের ওলীদের শক্তির সঙ্গে শয়তানের বন্ধুদের মিথ্যা দম্ভ, অহংকার ও শক্তি-সামর্থ্যের মরীচিকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ঐদিন যদি মুসলিমরা কুরাইশীদের ব্যবসায়িক কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করতো; তাহলে বলা হতো যে, আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আগ্রাসী যেকোনও দল এমন বেসামরিক কাফেলাকে পরাজিত করে তাদের ব্যবসায়িক পণ্য জবরদখল করতে পারবে।

এ কারণেই আল্লাহ ব্যবসায়ী কাফেলা আক্রমণের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন এক সামরিক বাহিনীর দ্বারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেছেন, যেন গোটা বিশ্বের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা যায়। যুদ্ধের ইচ্ছা ও প্রস্তুতি না নিয়েই বের হওয়া অল্পকিছু মুমিন মুসলিম; কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রস্তুতিসম্পন্ন বিরাট কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসাধারণ বিজয় নিশ্চিত করেছিল।

ইসলামের গৌরবান্বিত ইতিহাসে উক্ত যুদ্ধ - সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী প্রথম যুদ্ধ, যা পৃথিবীতে নতুন ইতিহাসের সূচনা করে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। ইসলামের বিস্তৃত ইতিহাসে এমন আরও বহু যুদ্ধ রয়েছে। তবে আজ আমি এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের বর্তমান যুগের সত্য মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টকারী ইসলামের গৌরবময় যুদ্ধগুলোর শেষ দিককার এক যুদ্ধ নিয়ে।

আধুনিক বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের এগার তারিখের ঘটনা। যে সমস্ত তাৎপর্য ও মৌলিকত্ব সামনে রেখে বদরে কুবরাকে আমরা স্মরণ করে থাকি, তেমনই কিছু তাৎপর্য এই ঘটনায়ও রয়েছে। এই ঘটনার দিন সত্য মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কুরাইশ বাহিনী সামরিক সংঘর্ষে তাদের বাহিনীর উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হারাবার বিরাট লজ্জা ও গ্লানি ঢাকার জন্য এবং মানুষের দৃষ্টি সে দিক থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা রক্ষার বিষয়টাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। একইভাবে আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বড় দুটো টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। যাতে মার্কিন সামরিক অধিদপ্তর পেন্টাগনে হামলা এবং সেখানে হাজার খানেক মার্কিন সামরিক কর্মকর্তার নিহত হবার গ্লানি ও লজ্জা ঢাকতে পারে।

সেপ্টেম্বরের ঐ দিনকে যতই মুছে ফেলার চেষ্টা করা হোক না কেন, হিংসুকের দল সেই দিনকে যতই আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, সমকালীন সমর বিশেষজ্ঞ ও কৌশলবিদরা যতই এর মর্যাদা খাটো করে দেখাতে চেষ্টা করুক না কেন - ইসলামের ইতিহাসে মহান এই যুদ্ধ অন্যান্য বহু যুদ্ধের মতই অমর হয়ে থাকবে।

বদরে কুবরা'র মহান সেই যুদ্ধ সেসময়কার যুগের হুবাল মূর্তির স্তম্ভগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রধান আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এ যুগের হুবাল মূর্তি চূর্ণ করার প্রধান আঘাত হিসেবে ৯/১১ এর ঘটনা মহান বদর যুদ্ধেরই কাছাকাছি তাৎপর্য ধারণ করে আছে বলে ধরা যায়।

মার্কিন ইতিহাসবিদরা অনুধাবন করেছে যে, মহান বদর যুদ্ধের মতোই ৯/১১ দিনটা ছিল সময়ের ধারাকে চিরে দু'ভাগ করে দেয়ার মত এক ধারালো রেখা। এ বিষয়টা সবচেয়ে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন মার্কিন ইতিহাসবিদ পল কেনেডি। তিনি তার বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে তার পরবর্তী সময়ের যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে, তা সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের প্রলয়ংকরী ঘটনার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ইতিহাসবিদ পল কেনেডির ভাষ্যমতে ঐ দিনের ঘটনা ও আক্রমণগুলো মানব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। আমেরিকা ঐ ঘটনার পর থেকে নিজেদের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এবং পূর্বের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসন পুনর্বহাল করতে চেষ্টা করে আসছে। ইতিহাসবিদ পল কেনেডির মতে আমেরিকার গৌরবের সর্ববৃহৎ দুই প্রতীক, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শক্তিকেন্দ্র মার্কিন সামরিক মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর ভবন 'পেন্টাগন' এবং আকাশচুম্বী বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের 'টুইন টাওয়ার' আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঘটনার পর – আমেরিকা আর কখনোই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। আঘাতপ্রাপ্ত টুইন টাওয়ার গোটা বিশ্বে মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপট, অহংকার ও কদর্যতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক আগ্রাসন পরিচালনার এক বড় নিদর্শন ছিল। সেপ্টেম্বরের ঐ ঘটনার তেজ, ভয়াবহতা ও উত্তাপ কেবল তার প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা বিচারেই নয়, বরং আকস্মিকতা ও কল্পনাতীত চরিত্র বিচারেও অনন্য। হামলাগুলো আমেরিকাকে এমনভাবে আঘাত করেছে যে, তারা মোটেও এমন ভয়াবহ হামলার কথা কল্পনা করতে পারেনি।

প্রিয় পাঠকবর্গ! চলুন আমরা একটু পেছনে ফিরে তাকাই; নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসের একটি পাতা চোখের সামনে মেলে ধরি। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ সকালে গোটা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয় যে, আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে উঁচু ভবন ও মার্কিন সর্বাধুনিক সুরক্ষিত দুর্গ অজ্ঞাত আক্রমণের শিকার হয়েছে। পরবর্তীতে জানা যায়, ১৯ জন মুসলিম বীর বাহাদুর মিলে বৃহত্তর রোমের মধ্যখানে এবং রাজধানীর একেবারে প্রাণকেন্দ্রে এক বিরাট ধামাকা সৃষ্টি করেছে। সে সময় মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলো বলেছিল, পৃথিবীর কোনও এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের উসামা বিন লাদেন নামক এক মুসলিম ব্যক্তি কান্দাহার থেকে চারটি বর্শা নিক্ষেপ করেছে। তার মধ্যে তিনটি বর্শা মার্কিন সামরিক বক্ষমূল পেন্টাগন এবং মার্কিন অর্থনীতির প্রধান দুই ভবনে বিদ্ধ হয়েছে। ঘোষিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রক্ষেপিত সেই চারটি বর্শার আঘাতে ৬০০০ এর অধিক আমেরিকান নিহত হয়। এ সংখ্যাটা পার্ল হারবার আক্রমণে নিহতের সংখ্যার দ্বিগুণ।

জি হ্যাঁ, সত্যিই মুসলিম বীর বাহাদুররা ইতিহাসের এক বিরাট কুফরি ও শিরকি মহা শক্তিধর গোষ্ঠীকে এভাবেই নাকানি চুবানি খাইয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় সামরিক স্থাপত্য পেন্টাগনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। আমেরিকার অর্থনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। এক অমর গাজওয়ার মাধ্যমে এসব ঘটেছিল। গোটা বিশ্ববাসী এগুলো ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছিল। মানব ইতিহাসের সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এমন সামরিক ও কৌশলপূর্ণ হামলার ঘটনা দেখা যায়নি।

১১ই সেপ্টেম্বরের সকালে বদরী তাৎপর্যবাহী মোবারক ঐ যুদ্ধে বিশ্ববাসী যা দেখেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল: পুঁজিবাদী বিশ্বের রাজধানীর সর্বোচ্চ, সুবিশাল, পর্বত-প্রমাণ নিদর্শন কিভাবে কতক মুসলিম যোদ্ধার আক্রমণের মুখে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! বিরাট স্থাপত্য নিমিষেই কাঁচ, লোহা ও শ্বাসরোধকারী ধুলোর স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এরপর আমেরিকান শক্তি ও সামরিক কেন্দ্র পেন্টাগন একই পরিস্থিতির শিকার হলো।

এই হামলার মধ্য দিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের উচ্চতর অংশ, সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসার ও ব্যক্তিবর্গ - এই অংশটাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো সম্ভব হয়েছিল। এমনকি এর ফলে প্রেসিডেন্ট বুশের এয়ারফোর্স দীর্ঘ একটা সময়ের জন্য এই চিন্তা করছিল যে, তারা রাজধানী ওয়াশিংটন ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট জয়নুল আবেদিনের এয়ারফোর্স যেমনিভাবে শহর ছেড়ে পালিয়েছিল, সেভাবেই তারা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। আকাশ পথে, স্থলপথে নিরাপদ এক টুকরো জায়গা পাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের এয়ারফোর্স দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করছিল ১৯ জন মুসলিম যোদ্ধা রাজধানী দখলে নিয়ে নিয়েছে। এ কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এয়ারফোর্স বুঝতে পারছিল না কোথায় তাদের বিমান ল্যান্ড করাবে?!

বুশ এবং বুশের মিত্ররা মাটির নিচে চলে গিয়ে দুনিয়াকে বিদায় জানাবার আগেই মুসলিম উম্মাহর বীর বাহাদুররা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের নিরাপত্তা বেষ্টিত, পারমাণবিক শক্তিধর সুদৃঢ় মহাদেশের নিরাপত্তার ধারণাকে অতীত করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে মার্কিন দাপট ও প্রতাপকে চিরতরের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজধানী ছেড়ে আত্মগোপন করা ও পালিয়ে যাবার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তার সকল প্রতাপ নিয়ে সারা বিশ্বে পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিচালনা থেকে সরে আসার সূচনা হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন শ্রীলংকার অতি সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক দৃশ্যগুলোর মতই একটি দৃশ্য সময়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। যথাসময়ে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন এমন হয়ে যাবে যেন এগুলো ভূত-প্রেতের শহর।

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সংঘটিত মহান দু'টি যুদ্ধ যেন আমেরিকাকে নতুন করে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের মতোই আপন স্বভাবজাত পরিণতির পথে নিয়ে যেতে শুরু করেছে, যেসব রাষ্ট্র কালের আবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি বরণ করেছে। গত দুই দশক ধরে আমরা আমেরিকার এই পরিবর্তিত আচরণ দেখতে পাচ্ছি।

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মার্কিন কার্যকলাপ পদ্ধতি আমরা পূর্ব থেকে প্রত্যক্ষ করে আসছি। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, চাপ প্রয়োগ অথবা সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু আদায় করে নেয়া, নানান মার্কিন বিবৃতি ও প্রত্যক্ষ হুমকি-ধমকির যে চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে যেগুলো এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেপ্টেম্বরে প্রলয়ংকরী অভিযানে মার্কিন ইতিহাসে চিরকালের জন্য যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং পূর্বের আচরণে যে পরিবর্তন এসেছে - তা পরিবর্তিত আচরণ থেকে স্পষ্ট। এই বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেপ্টেম্বরের অভিযান মার্কিনীদের উন্মত্ত আচরণ ও দাম্ভিকতার স্থবির ধারণাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। এক অস্থির আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ এই অভিযানের ঘটনা আমেরিকার আত্মসম্মানের অনুভূতিকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে।

আমেরিকার মাটিতেই আমেরিকার উপর হামলা তাদেরকে এমন এক চূড়ান্ত লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলেছিল যা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। যুগান্তকারী এই অভিযান জোরালোভাবে এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, মার্কিন পরাশক্তি কার্যকরীভাবে অধঃপতন, দুর্বলতা ও ভেতর থেকে ক্ষয় হয়ে যাবার সূচনামূলক পর্যায়ে আছে। তারা আগের সেই পরাশক্তি আর নেই। আর ৯/১১ ঘটনাই তাদের পরাশক্তি থেকে সাধারণ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা।

মনোযোগের সাথে জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পাঠ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পায়: যখনই কোনও পরাশক্তি তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে, তখনই ধীরে ধীরে ক্ষমতা হ্রাস পাবার লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এর কিছুটা দৃশ্যমান হয়, বাকিটা অদৃশ্য থেকে যায়। ক্ষমতা হ্রাসের এই প্রক্রিয়া ধীরগতির হয় ঠিক, তবে তা বন্ধ হয়ে যায় না।

বদরের যুদ্ধক্ষেত্র

যাইহোক, এই ধারা সাধারণত সূক্ষ্ম এবং শুধুমাত্র সংঘটনের পর তা দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি প্রায়ই তা প্রকাশ পেতে দশক এর পর দশক সময় লেগে যায়। আমেরিকার ক্ষেত্রেও পতনের দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার পর। এর মাধ্যমে যেন মহিমান্বিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পৃথিবীর বাসিন্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর বিধান সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক। তাঁর আদেশ সব কিছুর উপর কার্যকর ও তাঁর শক্তি অপ্রতিরোধ্য। যখন তিনি বলেন, 'হও', তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। ১১ই সেপ্টেম্বরের বদরী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি আমেরিকার দুর্ভাগ্যের প্রতীক ও মৃত্যু যন্ত্রণাময় একটি মুহূর্ত।

এই ঘটনটি বজ্রপাতের মত তড়িৎ গতিতে ঘটানো হয়েছিল, যা আমেরিকার বিশ্ব কর্তৃত্ব ও সম্মানের সাথে বেমানান ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য আমেরিকা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিল; যেটি চিরতরে জ্বলতে থাকবে। হামলার মাত্র একমাস পূর্বে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। সেখানে সে গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিল, "কমপক্ষে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকবে"। ৯/১১ আমেরিকার ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে নড়বড়ে করার মত একটি বড় ধাক্কা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে নিজেকে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় আবিষ্কার করে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারকারী নিজেকে হিসেবে দেখাতে চাওয়া আমেরিকা নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সময়ে অল্পসংখ্যক বিশ্লেষকই ক্ষমতার বৈশ্বিক ভারসাম্যের উপর এই আক্রমণের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার পরবর্তী মাসেই এই ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের বিষয়ে প্রচুর ভিন্ন ধরণের মতামত এসেছিল। এই স্তরে কেউ প্রকৃত বাস্তবতা বুঝে উঠতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে একবিংশ শতাব্দীর শুরুটা এর চাইতে এর বেশি নাটকীয় হতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে কিছু বিশ্লেষক অনুধাবন করতে শুরু করলেন যে, আমেরিকার আধিপত্যের উপর এই আক্রমণ প্রত্যাশিত অন্য যেকোনও বিষয়ের চেয়ে 'বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যের' ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন বয়ে আনবে।

এই আক্রমণের কৌশলগত দিকের হিসেবে বলা যায়, শত্রু আমেরিকার জন্য এটা ছিল তীব্র অর্থনৈতিক ও সামরিক অবনতি। এই একটি আক্রমণে সামরিক দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যে কয়েকটি যুদ্ধ করেছে সেগুলোর ক্ষতির পরিমাণের চেয়েও বেশি।

পেন্টাগনের উপর আক্রমণের মানবিক ক্ষতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বছরের পর বছর ধরে একত্রিত করা অনেক কর্মকর্তা এই হামলায় নিহত হয়। এরা তাদের অভিজ্ঞতার কারণে উঁচু মানের প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সামরিক যন্ত্রপাতি থেকেও মূল্যবান ছিল। পেন্টাগনে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছাড়াই, আমেরিকা আফগান ও ইরাক যুদ্ধে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। আর আফগান ও ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয়ের এটা একটি অন্যতম কারণ।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই আক্রমণ তাৎক্ষণিক বিধ্বস্ততার ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও, আমেরিকার অর্থনীতির উপর এক সুদীর্ঘ প্রভাব ফেলে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ফলে বহু সংখ্যক আমেরিকান কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একসাথে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মৃত্যু - তাদের দ্বারা পরিচালিত কোম্পানি ও ব্যবসাগুলোকে অকেজো করে ফেলে। সময়ের সাথে সাথে, সমগ্র মার্কিন অর্থনীতিতে টানা-পোড়নের দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সত্য হলো ৯/১১ আমেরিকাকে এমনটি একটি গভীর খাদ ও আর্থিক সমস্যায় নিক্ষেপ করে যার কোনও সীমা নেই। আক্রমণের পরবর্তী বছরগুলোতে আমেরিকার জাতীয় ঋণ অভূতপূর্ব হারে বেড়ে যায়। 90 এর দশকে আমেরিকা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপভোগ করেছিল হঠাৎ করেই তার সমাপ্তি ঘটে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, মাত্র ২০ বছর পর আমেরিকান সরকার আমেরিকান বাচ্চাদের জন্য দুধের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হবে এবং গোটা আমেরিকায় মাত্র এক লিটার পেট্রোলের জন্য নাগরিকদের ঝগড়া একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হবে? প্রায় একই সময়ে ও দ্রুততার সাথে আমেরিকার দু'টি যুদ্ধে (আফগানিস্তান ও ইরাকে) প্রবেশ করা শুধু আমেরিকার সামরিক দুর্বলতাই প্রকাশ করেনি; বরং সমভাবে রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা ও ওয়াশিংটনের প্রতিজ্ঞার অসাড়তাকেও স্পষ্ট করেছে। ইরাক ও আফগান যুদ্ধ - ইতিহাস সম্পর্কে আমেরিকার অজ্ঞতাকে সুস্পষ্ট করেছে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকানদের অজ্ঞতার বিষয়টিও এই দুই যুদ্ধের দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। আমেরিকা প্রথমে আফগান ও পরে ইরাকে দ্রুত সংগঠিত শক্তিশালী সামরিক জোট নিয়ে প্রবেশ করেছিল। সময়ের সাথে সাথে সেই জোট ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অপরিকল্পিতভাবে দু'টি যুদ্ধে প্রবেশ পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত ব্যাপার হলো - এই বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমেরিকার ছিল না। আমেরিকা তার সামরিক বাহিনীসহ মারাত্মক এক ফাঁদে পা দেয় এমন এক সময়ে যখন আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমেরিকাবাসী নিজেদেরকে নিজ দেশে অনিরাপদ অবস্থায় আবিষ্কার করে।

৯/১১ এর আরেকটি প্রাসঙ্গিক কৌশলগত অর্জন হলো - এটি পশ্চিমা খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের মধ্যে বিভেদ উস্কে দিয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক ও পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের একটি বড় দল ৯/১১ এর পর আমেরিকাকে বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ারের আসন থেকে নামিয়ে দেয়। আফগান যুদ্ধে পরাজয় বরণ ও সাম্প্রতিক ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার অবস্থা - একছত্র কর্তৃত্বের আসনটি থেকে তাদের সরে যাওয়ার বিষয়টি এমনভাবে স্পষ্ট করেছে, যা উপেক্ষা করা যায় না।

নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে - 9/11 আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতার উদাহরণ। মাত্র ১৯ জন ব্যক্তি তাদের খুবই সীমিত আসবাবের সাহায্যে আমেরিকার বেসামরিক এবং সামরিক উভয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা আমেরিকাবাসীর মনে নিচের প্রশ্নগুলোর উদ্রেক ঘটিয়েছে –

মাত্র ১৯ জন ব্যক্তির দ্বারা যদি এমন অবস্থা হয়, তবে কোনও রাষ্ট্র বা সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশ আমেরিকায় আক্রমণ করলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

যদি এই সন্ত্রাসীদের (তাদের ভাষায়) হাতে অশোধিত নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকে, তখন কি হবে?

যদি এরা আমেরিকার মাটিতে কেমিক্যাল বা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ করতো তবে অবস্থা কি হত?

আমেরিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনীতিসহ বিভিন্ন শাখায় ৯/১১ এর বরকতময় হামলার প্রভাব আজও পর্যন্ত অনুভূত হচ্ছে। একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্পের পর যেমন আফটার শক অনুভূত হতে থাকে; তেমনি সুদূর ভবিষ্যতেও এই বরকতময় হামলার প্রভাব দেখা যেতে থাকবে ইনশা আল্লাহ। এ কারণেই ৯/১১ এর ঘটনাকে ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের ধারাবাহিকতা বলে সাব্যস্ত করা যায়। সেপ্টেম্বরের এই ঘটনাকে মূল্যায়ন করার জন্য সেটাই শর্ত হবে, যেটাকে ফিকহে ইসলামী বা ইসলামী আইন শাস্ত্রের ইজমা (কোন বিষয়ে সকল মুসলমানের কিংবা মুসলমানের বিশেষ শ্রেণীর ঐক্যমত্য) সাব্যস্ত হবার জন্য শর্ত করা হয়েছে।

আর তা হলো - যে যুগে ঐক্যমত্য সাব্যস্ত হওয়া না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন, সে যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া। এভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি হয়নি তা মূল্যায়ন করা যায়। বর্তমান এই যুগ অতিক্রান্ত হবার পর সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। কারণ, কোন বড় বিষয়কে মেনে নেয়া এবং সাপোর্ট করার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে - সেই বিষয়ের সমসাময়িকতা তথা সেই বিষয় বা ঘটনার যুগ এখন পর্যন্ত অতীত না হওয়া। আমাদের ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু জাঁদরেল মুসলিম বীর বাহাদুর ও যুগান্তকারী গৌরবময় অভিযানের নজির রয়েছে, যারা এবং যে অভিযানগুলো সাধারণভাবে মানুষের মুখে মুখে প্রশংসা লাভ ততদিন পর্যন্ত করতে পারেনি, যতদিন পর্যন্ত সমকালীন প্রেক্ষাপট - যেখানে ছিল হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা ও অপরকে পরাজিত করার মানসিকতা - সেই প্রেক্ষাপট অতীত না হয়েছে। সমসাময়িকদের সাফল্য, অগ্রসরতা, যোগ্যতা ও সুচারুতা স্বীকার করতে কার্পণ্য করা – এটা সবসময়ের সাধারণ প্রবণতা।

বাস্তব কথা হল সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের ঘটনাটা এমন ছিল যে, তা ঐ ঘটনার পরবর্তী সময়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী সময়ের একটা পার্থক্য তৈরি করেই দিয়েছে। এই দিক থেকে এই দিনটি একটি যুগান্তকারী দিবস। যেমনিভাবে বদরে কুবরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কাফের ও তাগুত গোষ্ঠীর বড় বড় মাথাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে সেপ্টেম্বরের মহান ঐ দিনে আল্লাহ তায়ালা এ যুগের সবচেয়ে বড় মূর্তি আমেরিকার মাথাকে চূর্ণ করেছেন। কায়েদাতুল জিহাদের বীর বাহাদুরদের হাতে মার্কিন ঝাণ্ডাবাহীদেরকে লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত করেছেন। সেই দিক থেকে এ ঘটনায় বদরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত ছিল। সেইসাথে এ ঘটনা নববী যুগের মহান সেই অভিযানের বহু তাৎপর্যের মাঝে একটি বিশেষ তাৎপর্য ধারণকারী। আল্লাহ তায়ালা গৌরবময় ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মাগুলোর প্রতি রহম করুন যেগুলো আমেরিকার মাটির নিচে ঠিকানা গ্রহণ করে নিয়েছে। আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক!

> সবশেষে বলতে চাই, যুগান্তকারী ঐ দুই দিবস - বদরের দিন এবং সেপ্টেম্বরের দিন থেকেই কাফের পরাশক্তির সমাপ্তির সূচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। ১৭/০৯/০২ হিজরির শুক্রবারে বদরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই কুরাইশী কাফের গোষ্ঠী এবং রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য তাদের পরাজয়ের দিন গুনতে শুরু করেছিল। একইভাবে ২৩/০৬/১৪২২ হিজরি মোতাবেক ০৯/১১/২০০১ খ্রিস্টাব্দের মঙ্গলবারের ঘটনার দ্বারা আমেরিকার পতনের দিন গণনা শুরু হওয়ার বিষয়টি অল্প কয়েকজনই সেসময় উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ধীরে ধীরে মাস ও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের নিপীড়িতরা জেগে উঠতে শুরু করল।

ইতিহাস জুড়ে আল্লাহ তায়ালার সুন্নত এমনটাই। মহান আল্লাহ বলেন,

“অর্থঃ দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৫) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।” (সুরা কাসাস ২৮:৫-৬)

একজন ব্যক্তির বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা যত ভালোই হোক না কেন, সে কখনো আশা বা কল্পনা করতে পারেনি যে, ১৯ জন মুসলিম বীর বাহাদুর ৬০০০ কাফেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। এই দুর্ভোগের পরিমাণ যে এমন হবে, সেটা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। অথচ তাদের কাছে বক্স কাটার ছাড়া আর কোনও অস্ত্র ছিল না!

অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর আকাশ থেকে নজরদারি চালানোর জন্য আমেরিকার রয়েছে গুপ্তচর স্যাটেলাইট। রয়েছে CIA এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বিশালাকার সামরিক স্থাপনা।

মুসলিম উম্মাহর অগ্রগামী দল 'আল কায়দা'র মাধ্যমে চালানো এই অপারেশনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সফল করেছেন। আগামী দিনগুলোতে এই বরকতময় হামলা আল কায়দার 'জিহাদ ও প্রতিরোধের' মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে ইনশা আল্লাহ। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।
আল্লাহ তায়ালা ইসলামী ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা রচয়িতাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যিনি তার মধুময় কবিতা উপহার দিয়েছেন -

সংকল্পকারীদের নিখাদ সংকল্পের প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
এমন সবর ও ধৈর্যের প্রশংসা আল্লাহর জন্য; ধৈর্য নিজেও যা কখনো দেখেনি।
এমন অস্ত্রের তীব্র আঘাতের প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যে আঘাত আগে কখনো দেখা যায়নি...
...... রুদাইনিয়া মহিলা সম্পর্কে নৈশ আলাপের মাঝেও এমন গল্প শোনা যায়নি।
কুফরকে আঘাত করার কোন অভিযান, এই অভিযানের মত ছিল না।
কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকাবেলায় এমন সাহায্য পাওয়া যায়নি এবং কোন মোকাবেলাই এমন অভূতপূর্ব ছিল না।
যুদ্ধের মাঝে যখন আমরা কুফরি শক্তির বাড়ির উঠোনে এসে অবতরণ করি,
তখন সেখানে মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে আর ভীতি সঞ্চারিত হয়।
হে বীর বাহাদুরের দল! তোমরা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কুফরি শক্তির দেহকে এমন আঘাত করেছ, যার দরুন তার মাথা চূর্ণ হয়েছে আর পৃষ্ঠ ভেঙে পড়েছে।
কুফরি শক্তির কেল্লা মাটির সাথে মিশে গেছে, সেই আক্রমণে কুফরি শক্তির এক ভাগ ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে একভাগ জ্বলে গেছে,
তখন ভীতিকর পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা উপস্থিত হবার দরুন... এমনি প্রলয়কাণ্ড ঘটেছে, যে অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে হয়ে যেতে হয় দিশেহারা আর কবিতা প্রকাশ করে তার অক্ষমতা।
শত্রুপক্ষের মূল কেন্দ্র আগুনে দগ্ধ হয়েছে, বস্তুত এ ছিল এক নিষিদ্ধ কেন্দ্র তা কোনই উপকারে আসেনি,
তখন তারা ভয়ের কারণে এমনভাবে দ্রুত বেগে ছুটে পালালো, ভয়ের চোটে ইঁদুর যেমনিভাবে ছুটে পালায়।
তোমরা কুফরি শক্তির কাছ থেকে এমন প্রতিশোধ আদায় করে নিয়েছো, যে প্রতিশোধে কুফরি শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিশোধ এমনই হওয়া উচিত।
তোমরা এমন বহু অন্তরকে প্রশান্ত করেছ, ইতিপূর্বে যে অন্তরগুলোতে ছিল প্রতিশোধ স্পৃহা আর ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।
দীর্ঘ সময় পর হলেও, প্রতিশোধের আগুনে জ্বলজ্বলে অন্তরগুলো আজ শীতল হলো।
ইতিহাসের যৌবন চলে যাবার পর পুনরায় তোমরা ইতিহাসকে জাগ্রত করেছ এবং তার মাঝে যৌবনের চাঞ্চল্য ফিরিয়ে দিয়েছ,
এর ফলে 'হিত্তিন' পুনরায় জেগে উঠেছে, বদরের হাতিয়ার পুনরায় গর্জে উঠেছে।

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ

وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٥

وَنُمَكِّنَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ

وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا

مِنۡهُم مَّا كَانُواْ يَحۡذَرُونَ ٦ ﴾

“অর্থঃ দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৫) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।” (সুরা কাসাস ২৮:৫-৬)